রাষ্ট্র বিনির্মাণে কয়েকটি প্রস্তাব (পর্ব-১)

কালবেলা |
মতামত | উপ-সম্পাদকীয় |
৩০ আগস্ট ২০২৩ |

ড. সাজ্জাদ জহির |

বাংলাদেশের চলমান অনৈক্যের সাথে জড়িয়ে আছে দেশ ও জনগণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মতবিনিময়ের অনুপস্থিতি এবং মত-পার্থক্য মেটানোর স্বচ্ছ ও সুষ্ঠু প্রক্রিয়ার অভাব। সর্বোপরি, আঞ্চলিক ও বিশ্বপরিসরের পরাশক্তিদের কাছে অধিকাংশ রাজনৈতিক দল ও ব্যক্তিত্বের নতজানু অবস্থান আমাদের তরুণদের মাঝে তীব্র হীনমন্যতা বোধের জন্ম দিচ্ছে। একইসাথে বিভিন্ন পেশায় শিক্ষিত সমাজের শীর্ষস্থানীয়দের এক বিশাল অংশ, ধোঁয়াশা দ্বৈত নাগরিকত্বের আশ্রয়ে ভিনদেশের প্রতি আনুগত্যে আবদ্ধ। অথচ, তাদের কেউ কেউ আজ রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের ও নীতিনির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ পদ দখল করে রাষ্ট্র-নির্মাণে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে। আগামীতে কারা কোন প্রক্রিয়ায় এই ভূখণ্ডকে শাসন করার ন্যায্য অধিকার পাবেন, সে আলোচনা এখানে করব না। একটি সমৃদ্ধশীল, সৌহার্দ্যপূর্ণ ও দারিদ্র্যমুক্ত সমাজ গড়া এবং এখানকার সব নাগরিক যেন সম্মানের সাথে বিশ্বপরিসরে বিচরণ করতে পারে, সেসব অর্জনের জন্য রাষ্ট্রকে পুনর্গঠন করা প্রয়োজন। তাই, ক্ষমতায় যেই আসুক না কেন, সেই রাজনৈতিক নেতৃত্বের বিবেচনার জন্য কয়েকটি প্রস্তাবনা রাখব, যার মাত্র দুটি পৃথক দুই পর্বে উল্লেখ করব।

১। রাষ্ট্রের পরিসীমা– ভৌগোলিক ও জনগোষ্ঠীভিত্তিক

একটি দেশের ভৌগোলিক পরিসীমা থাকে এবং বাংলাদেশের মানচিত্র, যার সীমানা প্রতিবেশী দেশগুলোর সাথে চুক্তির মাধ্যমে স্বীকৃত, তা আজকের ডিজিটাল যুগে অতি সহজেই স্থায়ীভাবে চিহ্নিত করা সম্ভব। তবে রাষ্ট্রের পরিসীমা কি কেবলই দেশের ভৌগোলিক পরিসীমার মাঝে আবদ্ধ থাকবে? আরও দুটো ক্ষেত্র রয়েছে— 'জল ও ভূগর্ভস্থ সম্পদ' এবং জনগোষ্ঠী, যা ভৌগোলিক সীমানাকে পেরিয়ে যায়। প্রথমটির ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক কনভেনশন রয়েছে, তাই আলোচনায় তুলছি না। জনগোষ্ঠীকে চিহ্নিত করে রাষ্ট্রের দায়িত্ব-বলয় সুনির্দিষ্ট করার উদ্দেশ্যে নিম্নে কিছু প্রসঙ্গ তোলা হয়েছে।

রাষ্ট্রের প্রধান দায়িত্ব তার নাগরিকের প্রতি, বিশেষত, দেশের ভৌগোলিক সীমানার অভ্যন্তরে অবস্থিত নাগরিকদের প্রতি। তবে, এর কিছু ব্যতিক্রম থাকতে পারে, যা কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিয়ে নিম্নে উল্লেখ করছি। বাংলাদেশের অনেক নাগরিক বিদেশে কর্মরত রয়েছেন। তাদের দেখভাল করার দায়িত্ব যেমন সেখানকার নিয়োগকারী ও সেদেশের সরকার-নিযুক্ত কর্তৃপক্ষের, তেমনি, সেইসব শ্রমিকদের নিরাপত্তা ও বিদেশের মাটিতে সম্মানজনক অবস্থান নিশ্চিত করার দায়িত্ব বাংলাদেশ রাষ্ট্রের ওপরও বর্তায়। একইভাবে বাইরে পড়তে যাওয়া ছাত্রছাত্রী, ব্যবসায়ী অথবা ভ্রমণকারীদের প্রতি সেজাতীয় দায়িত্ব রাষ্ট্রের রয়েছে। উপরের দায়িত্বের ব্যতিক্রম ঘটে সেসব ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে যারা ভিনদেশের নাগরিকত্ব নিয়েছে। এক্ষেত্রে নাগরিকত্ব খারিজের বিষয়ে সাংবিধানিক অস্পষ্টতার আড়ালে এবং কথিত দ্বৈত

নাগরিকত্বের বিশৃঙ্খলায় এককালীন উপনিবেশিক দেশগুলো আমাদের মতো দেশগুলোর মেধা, সম্পদ ও কর্মসংস্থান আত্মসাৎ করতে সক্ষম। এবিষয়ে সংবিধানে সংশোধনী জরুরি, যা দ্বিতীয় প্রস্তাবনায় উত্থাপন করা হয়েছে।

প্রকৃত নাগরিকদের বাইরে জনগোষ্ঠীর পরিচয়ের ভিত্তিতে রাষ্ট্রের দায়িত্বের পরিধি বিস্তৃতভাবে দেখা সম্ভব। নৃ-জাতি, ভাষা ও ধর্মকে ঘিরে আমাদের আত্মপরিচয় বিকশিত হয়েছে, যা নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মাঝ দিয়ে রাজনৈতিক পরিসরে একটি রাষ্ট্রের জন্ম দিয়েছে। পরিচয়ের প্রথম দুটো দিক (নৃ-জাতি ও ভাষা) সমধর্মী, যদিও শংকর হওয়ার কারণে বাঙালিকে ভাষার ওপর বেশি ভর করতে হয়। তবে, ঐতিহাসিকভাবে উপমহাদেশের পশ্চিমাঞ্চল, ইরান, আফগানিস্তান, ইয়েমেন, ইত্যাদি এলাকা থেকে আসা মানুষের সাথে সংমিশ্রণ ঘটলেও আজ সে অতীত আমাদের বর্ণ ও ধর্মে ছড়িয়ে আছে। একই মন্তব্য সম্ভবত বৈদিক যুগের বাইরে থেকে আসা সংস্কৃত ভাষাভাষীদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। ভৌগোলিকভাবে, পাশাপাশি জড়িয়ে সহাবস্থান করছে অসংখ্য ক্ষুদ্র নৃ-জাতি, যাদের থেকে প্রাচীন বাংলা ও বাঙালির ব্যুৎপত্তি ঘটেছিল। উভয় অর্থনীতি ও রাজনীতির প্রেক্ষিতে এই বর্তমানটাই অধিক প্রাসঙ্গিক। সেটাকে বিবেচনায় নিলে, তিনটি জনগোষ্ঠীর প্রতি রাষ্ট্রের দায়িত্ব ভেবে দেখা প্রয়োজন, যাদের প্রতিটিই সীমান্তের ভেতরে ও বাইরে অবস্থান করে (ইংরেজিতে যাদের ট্রান্স-বর্ডার কমিউনিটি বলা হয়)। প্রথমটি হলো, ধর্মসূত্রে এখানকার জনগোষ্ঠীর সাথে যারা সম্পর্কিত, অথচ যাদের অনেকের সাথে বাংলাদেশের কোনো সম্পর্ক নেই। দ্বিতীয়টিতে রয়েছে পৃথিবীর নানা দেশে ছড়িয়ে থাকা বাংলা ভাষাভাষী জনগোষ্ঠী, বিশেষত, সীমান্ত-সংলগ্ন এলাকায় যারা বসবাস করেন। তৃতীয় জনগোষ্ঠীতে রয়েছে বেশ কয়েকটি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী, যাদের এক বা একাধিক ধারা বাংলাদেশের ভৌগোলিক সীমানার অভ্যন্তরে বাস করে এবং এদেশেরই নাগরিক। তবে সেসব নৃগোষ্ঠীর অন্য অনেকে সীমান্তের ওপারে বসবাস করে। যদিও এই শেষোক্ত জনগোষ্ঠীর মাতৃভাষা বাংলা নয়, এটা আজ অনেকের মাঝে স্বীকৃত যে তাদের অনেকের ভাষা মিশ্রিত হয়ে প্রাচীন বাংলার জন্ম দিয়েছিল। এদের মাঝে সাঁওতাল, অহমীয়া (অসমীয়া), মণিপুরি, গারো, হাজং, চাকমা, খাসিয়া, ত্রিপুরী বা করবরক, মারমা, কুকি-চিন-মিজো গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত লুসাই, বম, পাংখো ও খুমি এবং আরাকানি (রোহিঙ্গা) উল্লেখযোগ্য।

শ্রেণি-প্রতিনিধিত্বকারী রাষ্ট্রব্যবস্থার আলোচনায় না গেলেও কেউ কেউ, ক্ষুদ্র আর্থিক দৃষ্টিকোণ থেকে, রাষ্ট্রের ভরণপোষণকারীদের মাঝেই রাষ্ট্রের দায় সীমাবদ্ধ রাখার প্রস্তাব দিতে পারেন। সে ক্ষেত্রে অনেকে রাষ্ট্রব্যবস্থাকে বিনিয়োগের খাত হিসেবে গণ্য করতে পারে। সেই যুক্তির আড়ালে দেশি-বিদেশি যে কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান একটি রাষ্ট্রকে নিয়ন্ত্রণ করে নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের সম্পদ লুণ্ঠন করতে পারে, যেমনটি করেছিল উপনিবেশিক (পশ্চিমা) দেশগুলো। বর্তমানকালে, এর একটি চরম প্রকাশ দেখতে পাই যখন আর্থিক ব্যবস্থা থেকে অর্থলুট, সংগ্রহ চুক্তির আড়ালে অথবা কর্মস্থল দখল করে সম্পদ পাচার এবং ঋণের দায়ভার স্থানীয় জনগোষ্ঠীর ওপর চাপিয়ে বৈদেশিক মুদ্রার ভাণ্ডার উজাড় হতে থাকা। আধুনিক অর্থব্যবস্থা ও আন্তর্জাতিক বিনিয়োগ নীতিতে দেনার এই দায়ভার মেটাতে একপর্যায়ে বাংলাদেশের সম্পদের মালিকানা বিদেশিদের হাতে যাওয়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। তাই পৃথক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা কাদের ও কিসের জন্য এবং তার দায়বদ্ধতা কাদের প্রতি থাকা বাঞ্ছনীয়, তা ভেবে দেখা প্রয়োজন। উল্লিখিত বিষয়গুলো সার্বিকভাবে মীমাংসা না করলে একটি বহুজাতিক এবং বহু ধর্মাবলম্বীদের রাষ্ট্র গড়ে তোলা সম্ভব নয়। আমার মূল প্রস্তাব, রাষ্ট্রের প্রাথমিক দায়িত্ব বাংলাদেশের নাগরিকের প্রতি, যারা অন্য কোনো দেশের প্রতি আইনি অনুগত্যে জড়াবেন না এবং বাংলাদেশের প্রতি

অনুগত থাকবেন। তবে, আন্তর্জাতিক বিধিনিষেধ গুণতিতে রেখে, পূর্বে উল্লিখিত বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর সাথে সুসম্পর্ক রাখা রাষ্ট্রের দায়িত্ব বলে আমি মনে করি। আন্তর্জাতিক কূটনীতির অঙ্গনে পথটি নিঃসন্দেহে পিচ্ছিল, তবে নীতিপর্যায়ে স্পষ্টতা সার্বভৌমত্বের জন্য আবশ্যিক।

এই অংশ শেষ করব, প্রতিবেশী দেশগুলোর জনগোষ্ঠীভিত্তিক কিছু অভিবাসন নীতির দৃষ্টান্ত দেখিয়ে। প্রথমেই উল্লেক্ষ- ইন্ডিয়ার নীতি অথবা ইন্ডিয়া নামক দেশটি যে স্বার্থের দ্বারা চালিত তাদের জনগোষ্ঠীকেন্দ্রিক নীতি। এপার থেকে দেখা মাত্র দুটো দিক উল্লেখ করব। সেদেশের সরকার ধর্মকে উল্লেখ করে পার্শ্ববর্তী দেশগুলোতে নির্দিষ্ট ধর্মাবলম্বী জনসাধারণদের জন্য সেদেশে দীর্ঘকাল বসবাসের জন্য বিশেষ ভিসার সুযোগ দেয়। কিন্তু মজার ব্যাপার, ইন্ডিয়ার কেন্দ্রীয় সরকার নিজ দেশের অভ্যন্তরে অনেক রাজ্যের ক্ষেত্রে নৃজাতির (বা ভাষার) ভিত্তিতে এনআরসি ও অন্যান্য নীতি অনুসরণ করে। প্রথম (ধর্মভিত্তিক) নীতি আঞ্চলিক শক্তি হিসেবে প্রতিবেশীদের ওপর নিঃসন্দেহে বাড়তি বিড়ম্বনার সৃষ্টি করে এবং এজাতীয় নীতি ক্ষুদ্র পরিসরে জাতি ও রাষ্ট্র গঠনকে দুরূহ করে। দ্বিতীয়টির তাৎপর্য সমরূপ, তবে তা উন্নয়নের নামে কোন কোন অঞ্চল বা রাজ্যকে দ্বিখণ্ডিত করে নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর স্বার্থে অনবায়নযোগ্য সম্পদ লুণ্ঠনের উদ্দেশ্যে নেওয়া হয় বলে অনেকের ধারণা।

মিয়ানমারের সরকার সংখ্যাগুরু জনগোষ্ঠীর সমর্থনে দীর্ঘকাল বেশ কয়েকটি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীকে নিপীড়ন করে আসছে, যা বহুক্ষেত্রে দেশি-বিদেশি আর্থিক স্বার্থের সাথে জড়িত। শেষোক্তটির একটি প্রকাশ হচ্ছে আরাকান থেকে সেখানকার জনবসতি উচ্ছেদ। উল্লেখ্য, রাখাইন/আরাকান রাজ্যে সিতওয়ের উপকূলে প্রাকৃতিক গ্যাস এবং চীনের কুনমিং অবধি জ্বালানি তেল ও গ্যাসের পাইপলাইনের নিরাপত্তা বিধান জরুরি ছিল। মিয়ানমারের নাগরিক নিবন্ধন কার্যক্রমে, আমার জানামতে, ইন্ডিয়ানরা একটি নাগরিক গোষ্ঠী হিসেবে চিহ্নিত এবং বাঙালি নামে একটি ভিন্ন শ্রেণি রয়েছে, যেখানে হিন্দু-মুসলমানভিত্তিক বিভাজনের কোনো অস্তিত্ব নেই!

উপরের দৃষ্টান্তগুলো দেওয়ার মূল কারণ, পার্শ্ববর্তী দেশগুলোর বৈরী নীতির প্রেক্ষিতে রাষ্ট্র-গঠনের জন্য বাংলাদেশ সরকারের কি ধরনের নীতি অনুসরণ করা উচিত, তা সুচিন্তিতভাবে প্রণয়ন করা প্রয়োজন। একাজের জন্য নাগরিকত্বের সীমানা টানা জরুরি, যা পরবর্তী পর্বে আলোচনা করা হবে।

নাগরিকত্ব আইনে দ্বৈত নাগরিক হওয়ার সুযোগ এলো কীভাবে? (পর্ব-২)

কালবেলা |
মতামত | উপ-সম্পাদকীয় |
১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৩০ |

ড. সাজ্জাদ জহির |

আমরা প্রায়ই রাজনীতি, প্রশাসন, নিরাপত্তাব্যবস্থা, রাজস্বব্যবস্থা, পরিকল্পনা, বৈদেশিক লেনদেন, ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করি। সম্ভবত, শিক্ষা ব্যতিরেকে, এসব আলোচনা একটি দেশ ও সরকারকে ঘিরে হয়, যাদের অস্তিত্ব নির্ভর করে বাংলাদেশ নামক স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের অস্তিত্বের ওপর। ভিন্ন কোনো প্রস্তাবনা না থাকলে, প্রথম পর্বের আলোচনার (কালবেলা, ৩০ আগস্ট ২০২৩) সূত্র ধরে আমি অনুমান করছি যে এ দেশের নাগরিকরা এই রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্বে থাকবে এবং নাগরিকের স্বার্থেই রাষ্ট্রের কর্মকাণ্ড পরিচালিত হবে। আজ তার দ্বিতীয় পর্ব প্রকাশ হলো। সেই প্রেক্ষিত থেকে উল্লেখ করেছিলাম যে নাগরিকত্বের আইনি সীমানা সুনির্দিষ্ট করা প্রতিটি রাষ্ট্রের জন্য জরুরি। বিষয়টি সংবিধান ও বিবিধ আইনকে নিয়ে, যা প্রাথমিকভাবে আইন বিশেষজ্ঞদের জ্ঞানের এক্তিয়ারভুক্ত। বেশ কয়েক বছর আগে প্রকাশিত একটি নিবন্ধে (প্রথম আলো, ইংরেজি সংস্করণ, ৩০ জানুয়ারি ২০১৯) নয়াউপনিবেশ-পরবর্তী পশ্চিমা প্রভাবিত বিশ্ব-ব্যবস্থাপনায় নতুন (আন্তঃদেশীয়) সামাজিক শ্রেণির উদ্ভবের প্রতি দৃষ্টিপাত করেছিলাম।[১] গত বছরে ডলার বাজারে অস্থিরতা বিশ্লেষণকালে দ্বৈত নাগরিকের উল্লেখ করেছিলাম (দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড, ২৬ আগস্ট ২০২২ ও ২৫ মার্চ ২০২৩), যাদের অনেকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ওই ব্যবস্থাপনার সাথে যুক্ত। সেই ধারাবাহিকতায়, এই বিশেষ সামাজিক গোষ্ঠীর গঠন ও গতি-প্রকৃতি যথার্থভাবে অনুধাবন প্রয়োজন। এই পর্বে এর আইনি দিকটি অনুধাবনে সচেষ্ট হব। আমি আইনের ছাত্র নই বিধায় নাগরিকত্ব আইনের বিবর্তন সম্পর্কে কয়েকজন যোগ্য ব্যক্তিদের পরামর্শ পেতে চেষ্টা করি। কিন্তু নানাবিধ কারণে কার্যকর সংযোগ গড়ে তোলা সম্ভব না হওয়ায় নিজেই পর্যালোচনার কাজটি করেছি। ত্রুটি থাকলে তা অনিচ্ছাকৃত এবং তা জনসমক্ষে শুধরে দেওয়ার দায়িত্ব আইন বিশেষজ্ঞদের। বর্তমান নিবন্ধে সংকুলান হবে না, তাই দ্বৈত নাগরিকের নানাবিধ তাৎপর্য বিচার-বিশ্লেষণ করে রাষ্ট্র বিনির্মাণে কাঙ্ক্ষিত পদক্ষেপ চিহ্নিত করবো শেষ (তৃতীয়) পর্বে ।

শুরুতে একটা বিষয় স্পষ্ট করা প্রয়োজন। আইনসংবলিত নথিপত্রে, বিশেষত ওয়েবসাইটের সংরক্ষিত ভাণ্ডারে, সনের উল্লেখ অনেক সময় আমার মতো বহিরাগতদের জন্য বোঝা দুরূহ। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর, নাগরিক আইন ১৯৫১ কার্যকর ছিল বলে জেনেছি এবং সম্ভবত সে কারণে, বাংলাদেশ নামটি সংযোজিত হওয়ার পরও আইনটির নামকরণে স্বাধীনতা-পূর্ববর্তী সনটি (১৯৫১) রয়ে গেছে। তেমনি, ১৯৭২ এর রাষ্ট্রপতি আদেশ (The Bangladesh Citizenship (Temporary Provisions) Order, 1972)-এর বর্তমান প্রকাশনায়, ১৯৭২-পরবর্তী সংশোধনী প্রায়ই এমনভাবে মিশে থাকে যে মনে হয় ১৯৭২ তেই সেগুলো প্রবর্তন করা হয়েছিল। যদিও পাদটীকায় উল্লেখ থাকে, তবে কবে কী কারণে এই সংযোজন হলো, তা সকল ক্ষেত্রে স্পষ্ট নয়। আইন পাঠে একজন বহিরাগত হওয়ায় মনে হয়েছে, রাষ্ট্র পাল্টালেও দৃষ্টান্ত দেয়ার জন্য পুরোনো রেফারেন্স দেওয়া

এবং পুরোনো আইনে প্রান্তিক পর্যায়ে কাটছাঁট করে বা পাদটীকা সংযোজন করে নতুন আইন প্রণয়ন সম্ভবত (শ্রমের বিচারে) সহজতর![২]

শুরুতে দ্বৈত নাগরিকত্বের অনুপস্থিতিঃ ১৯৫১ ও ১৯৭২

নৈর্ব্যক্তিক নির্ণায়কের অভাবে[৩] বাংলাদেশে নিখাদ নাগরিক-এর সংজ্ঞা দেওয়া দুরূহ। প্রত্যক্ষ উপনিবেশিক শাসনামল থেকে উদ্ভূত আইনের ফলে দেশ্যকরণ (বা দেশীয়করণ, ১৯২৬ এর ন্যাচারালাইজেশন আইনে যার উল্লেখ রয়েছে) এবং সনদ দেওয়ার মাধ্যমে নাগরিকত্ব প্রদানে সরকারের একচ্ছত্র ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা পায়।[৪] বিশেষত, বিচিত্র বিভাজন এনে দেশ-গঠন এবং তার ফলশ্রুতি হিসেবে বিপুলসংখ্যক বাস্তুহারা মানুষের নতুন করে ঠিকানা ও নাগরিকত্বের সন্ধান আইনের ভাষাকে অন্তর্ভুক্তিমূলক হতে বাধ্য করেছে। এর ফলে নাগরিকত্ব নির্ধারণে নৈর্ব্যক্তিকতাকে দূরে ঠেলে 'স্বৈর' সিদ্ধান্তের পথ সুগম হয়েছে। ১৯৫১ সনের নাগরিক আইনে এসব বিষয়িগুলোর প্রতিফলন ঘটেছিল। সে আইনের সারবস্তু (আমার জানামতে) ১৯৭২ সালের রাষ্ট্রপতি অধ্যাদেশে (The Bangladesh Citizenship (Temporary Provisions) Order, 1972) প্রাথমিক পর্যায়ে রক্ষা করা হয়েছিল। সেখানে স্পষ্টতই বলা হয় যে, **একজন প্রাপ্তবয়স্ক নির্দিষ্ট কোনো সময়ে যে কোনো একটি মাত্র দেশের নাগরিক হতে পারেন।**

অর্থাৎ, দ্বৈত-নাগরিক বা দ্বৈত-জাতীয়তা সে আইনে বারিত ছিল (অনুমোদনযোগ্য ছিল না)। এক্ষেত্রে, বাংলাদেশের জন্য রচিত ১৯৫১ এর আইনটি থেকে নিম্নের উদ্ধৃতি লক্ষণীয়, "… if any person is a citizen of Bangladesh under the provisions of this Act, and is at the same time a citizen or national of any other country, he shall, unless he makes a **declaration according to the laws of that other country renouncing his status as citizen or national thereof,** cease to be a citizen of Bangladesh." (উৎস: http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-242.html)

প্রাক্তন বিচারক ইকতেদার আহমেদ (দৈনিক নয়াদিগন্ত, ১৯ অক্টোবর ২০২১) ওপরের অনুচ্ছেদটি নিম্নরূপে উল্লেখ করেছেন, "নাগরিকত্ব আইন, ১৯৫১-এর ১৪ ধারায় দ্বৈত নাগরিকত্ব অথবা জাতীয়তা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। নাগরিকত্ব আইন, ১৯৫১-এর ১৪(১) ধারায় বলা হয়েছে- এই ধারার বিধানাবলি সাপেক্ষে যদি কোনো ব্যক্তি এ আইনের বিধানাবলির অধীন বাংলাদেশের নাগরিক হয়ে থাকেন এবং একই সময়ে অন্য কোনো দেশের নাগরিক বা অধিবাসী হয়ে থাকেন, তিনি যদি না **ওই দেশের আইন অনুযায়ী তার নাগরিক অথবা অধিবাসী মর্যাদা পরিত্যাগ করে ঘোষণা প্রদান না করে থাকেন,** সে ক্ষেত্রে বাংলাদেশের নাগরিক হওয়া হতে বিরত হবেন।"

নাগরিকত্বের সংজ্ঞার সাথে সংগতি রেখে, আমার জানামতে, ১৯৭২ এর সংবিধানে সংসদে অংশগ্রহণের যোগ্যতা নিম্নরূপে উল্লেখ করা হয়েছিল, "কোন ব্যক্তি সংসদের সদস্য নির্বাচিত হইবার এবং সংসদ-সদস্য থাকিবার যোগ্য হইবেন না, যদি …. তিনি কোনো বিদেশি রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব অর্জন করেন কিংবা কোনো বিদেশি রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য ঘোষণা বা স্বীকার করেন" ((গ), ১ম পরিচ্ছেদ, ৫ম ভাগ)। বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, যদি কেউ ভিনদেশের নাগরিকত্ব নিয়ে তা খারিজ করে পুনরায় বাংলাদেশের নাগরিকত্ব ফিরে পেতে চান, পুরোনো বিধিতে, **তাকে ওই দেশের আইন অনুযায়ী** তার নাগরিক অথবা অধিবাসী মর্যাদা পরিত্যাগের বাধ্যবাধকতা ছিল।

‘আইনি ব্যবস্থায়’ দ্বৈততার অন্তর্ভুক্তি এবং বিস্তার

[যারা বিশদতায় ক্লান্তিবোধ করবেন, তারা এই অংশটি এড়িয়ে সরাসরি পরবর্তী অংশে সংক্ষিপ্তসার দেখুন।]

১৯৭২ সনের রাষ্ট্রপতি আদেশের ২নং ধারায় নাগরিকত্ব সংক্রান্ত মূল বিষয় ব্যক্ত হয়েছে নিম্নরূপে– যে কোনো ব্যক্তির নিজের, অথবা তার পিতা বা প্রপিতামহের স্থায়ী নিবাস ১৯৭১ সনের ২৫ মার্চ তারিখে বাংলাদেশ ভূখণ্ডে ছিল এবং আইন প্রবর্তনকালে সে নিবাসী ছিল, তাকেই বাংলাদেশের নাগরিক গণ্য করা হয়। আইনে কিছু ব্যতিক্রমের উল্লেখ রয়েছে, যেমন শত্রুদেশে আটকেপড়া ব্যক্তিদের নাগরিকত্ব নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিধান রাখা। একইসাথে, দুটো বাড়তি বিধান উল্লেখ্য, (১) কোনো ব্যক্তির নাগরিকত্ব নিয়ে সংশয় দেখা দিলে সরকার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে পারবে, ও (২) **আদেশটির উদ্দেশ্য** (purposes) **অর্জনের জন্য** সরকার প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন করতে পারবে।

১৯৭৩ থেকে ধারাবাহিকভাবে নাগরিকত্ব আইনে সংশোধনী ও সংযোজনী এসেছে, এবং সে সঙ্গে সংবিধানে সংসদ সদস্যদের যোগ্যতা নির্ণয়ে পরিবর্তন এসেছে। এক্ষেত্রে লক্ষণীয় যে, ১৯৪৭-পরবর্তী অবস্থা বিবেচনায় এনে ১৯৫১-এর আইনে যে ধরনের বিধান রাখতে হয়েছিল, বাংলাদেশের স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে কিছু ক্ষেত্রে সমধর্মী অবস্থা বিরাজ করায়, নিবাস-সংক্রান্ত কিছু বিধি সংযোজন করতে হয়। তবে, যে উদ্দেশ্যে সেসব অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল, পরবর্তীতে তা থেকে ব্যত্যয় ঘটে। স্বাভাবিকভাবেই, বিভিন্ন সময়কার সরকার কর্তৃক প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন সব সময় প্রাথমিক (১৯৭২) আদেশের উদ্দেশ্য অর্জনের নিমিত্তে প্রণীত হয়েছে কিনা, সে ব্যাপারে প্রশ্ন রয়ে যায়। নিম্নে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি আইন পরিবর্তনের ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে।

১। The Bangladesh Citizenship (Temporary Provisions) (Amendment) Act, 1973 (Act No. V of 1973) এর মাধ্যমে যুক্তরাজ্যে নিবাসীদের বাংলাদেশে নিবাসরত গণ্য করা হয়। অর্থাৎ, নাগরিকত্ব আইনের ২নং ধারা সাধারণভাবে যদি কোনও ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় অথচ নির্দিষ্ট সময়ে (২৫ শে মার্চ, ১৯৭১ বা তার পরপরই?) তিনি যুক্তরাজ্যের নিবাসী ছিলেন, তবে তাকে বাংলাদেশ ভূখণ্ডের নিবাসী হিসেবে গণ্য করা হবে।[৫]

২। The Bangladesh Citizenship (Temporary Provisions) (Amendment) Ordinance, 1978 (Ordinance No. VII of 1978) মৌলিকভাবে পূর্বের নিবাস-সংক্রান্ত সংশয় থেকে বিযুক্ত করে নাগরিকত্বকে সরকারি প্রজ্ঞাপনে বন্দি করা হয়। এই অধ্যাদেশের ২নং অনুচ্ছেদ পূর্বের ২ এর (খ) ধারাকে প্রতিস্থাপিত করে, যেখানে উল্লেখ করা হয় যে,[৬] এই “বিধান অনুযায়ী ইউরোপ অথবা উত্তর আমেরিকা অথবা গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে নির্ধারিত অন্য যেকোনো রাষ্ট্রের নাগরিককে বাংলাদেশের নাগরিকত্ব দিতে পারেন সরকার” (ইকতেদার ২০২১ দ্রষ্টব্য)

নির্দিষ্টভাবে নামকরণ না করলেও, আমার সীমিত জ্ঞানে বুঝি যে, **১৯৭৮ এর অধ্যাদেশ থেকেই দ্বৈত নাগরিকত্বের আইনি যাত্রা শুরু**। সে সময়ে সমান্তরালভাবে যেসব ঘটনা চলমান ছিল, সেসব বিশ্লেষণ করলে সম্ভবত এই আইন প্রবর্তনের কারণ খুঁজে পাওয়া যেতে পারে! সেই দৃষ্টিকোণ থেকে মনে হয়েছে

যে, নির্দিষ্ট সময়ের ক্ষুদ্র স্বার্থ দেখতে যেয়ে এজাতীয় আইন প্রবর্তনের সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিবেচনায় নেয়া হয়নি।

৩। নাগরিকত্বের সীমানা বিস্তৃত করার ফলে সংবিধানে সংসদে অংশগ্রহণের যোগ্যতা বর্ণনায় নিম্নরূপ সংশোধনী আনতে হয়েছিল (৩ নং পাদটীকা, ১ম পরিচ্ছেদ, ৫ম ভাগ), "[(২ক) এই অনুচ্ছেদের (২) দফার (গ) উপ-দফা তে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোন ব্যক্তি জন্মসূত্রে বাংলাদেশের নাগরিক হইয়া কোন বিদেশি রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব অর্জন করিলে এবং পরবর্তীতে উক্ত ব্যক্তি- (ক) দ্বৈত নাগরিকত্ব গ্রহণের ক্ষেত্রে, বিদেশি রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব ত্যাগ করিলে[৭], কিংবা

(খ) অন্য ক্ষেত্রে, পুনরায় বাংলাদেশের নাগরিকত্ব গ্রহণ করিলে-

এই অনুচ্ছেদের উদ্দেশ্য সাধনকল্পে তিনি বিদেশি রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব অর্জন করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন না।]"

৪। ইকতেদার আহমেদ এর লেখায় এটা স্পষ্ট যে, ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্টের পর থেকে ১৯৭৯ সালের ৫ এপ্রিল পর্যন্ত সামরিক শাসনের সব কর্মকাণ্ডকে পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে বৈধতা দেওয়া হয়। এক্ষেত্রে ভবিষ্যৎ গবেষকদের জন্য কয়েকটি প্রশ্ন রাখব, (৪ক) এটা অনুধাবনযোগ্য যে, পাকিস্তান নামক একটি রাষ্ট্র বিভাজিত হয়ে যখন স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্র জন্ম নিল, তখন ১৯৭১ সনের ২৫শে মার্চ-কালে ব্যক্তির স্থায়ী নিবাস-এর ভিত্তিতে নাগরিকত্ব নির্ধারণে কিছু ব্যত্যয় ঘটবে। সেটাকে শুধরানোর উদ্দেশ্যে ১৯৭৩-এর সংশোধন প্রয়োজন ছিল। একই উদ্দেশ্য সাধনে যদি পরবর্তীতে অন্যান্য দেশে ১৯৭১ সনের নিবাসীদের অন্তর্ভুক্ত করবার প্রয়োজনে সংশোধনী আনা হতো, তা সংগতিপূর্ণ মনে হতো। কিন্তু ১৯৭৮ এর অধ্যাদেশ স্বাধীনতা অথবা স্বাধীনতার অব্যবহিত পরের সময়কালের সাথে কোনো সংশ্লিষ্টতা রাখেনি। এক্ষেত্রে সংবিধানের ধারাবাহিকতা রক্ষা করা হয়েছিল কি না, সে ব্যাপারে প্রশ্ন জাগে। বিশেষভাবে প্রশ্নবিদ্ধ হয়, উদ্দেশ্যের ভিন্নতা।

(৪খ) আমার জানামতে ১৯৭৮ এর অধ্যাদেশ আইনি মোড়ক পেয়েছিল পঞ্চম সংশোধনীতে, যা ১৯৭৯ সনের সংসদে গৃহীত হয়। অথচ পরবর্তীতে, পঞ্চম সংশোধনী বাতিল হওয়া সত্ত্বেও (২০১০ এর রায় ও ২০১১ সনের পঞ্চদশ সংশোধনী দ্রষ্টব্য) ১৯৭৮ এর (Temporary Provisions) (Amendment) অধ্যাদেশ কার্যকর কিভাবে থাকলো এবং কেন পূর্বের উদ্দেশ্যের সাথে সংগতি ফিরিয়ে আনা হলো না? [অনুমান করছি যে, বাতিলের সময় তার উল্লেখ রয়েছে যা আমার দৃষ্টিগোচর হয়নি।]

৫। ১৯৯০ এর দশকে দ্বৈত নাগরিকত্বের বিষয়টি কার্যক্ষেত্রে সম্মুখে আসেনি, যদিও নিবাস নির্ধারণ ও সেই সাথে দ্বিপাক্ষিক করচুক্তি সম্পাদনের কাজ শুরু হয়েছিল, যা গতি পায় এই শতাব্দীর শুরু থেকে।[৮] নথি ঘাটতে গিয়ে মনে হলো যে, অনেক সময় আইনের খসড়া রচিত হলেও তা উপযুক্ত সময়ের সন্ধানে ফাইলবন্দি থাকে। এপ্রসঙ্গে, আইন কমিশনের ২৬/০২/২০০৫ তারিখের একটি স্মারকপত্রের সূত্র ধরে আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রণালয় স্মারক নং আইন-অনুবাদ-১৩/০৭/-৩৬৫ (লেঃপ্রঃ তারিখ ০৩/০৭/০৭ ইং) বিশেষভাবে উল্লেখ্য। এর যে খসড়াটি দেখবার সুযোগ আমার হয়েছে, সেটিতে উল্লেখ রয়েছে যে মাত্র তিনটি শ্রেণির নাগরিকের জন্য নিবন্ধনের সনদ প্রযোজ্য — নিবন্ধনসূত্রে নাগরিকত্ব, দেশীয়করণের মাধ্যমে নাগরিকত্ব অর্জন, ও বৈবাহিকসূত্রে

নাগরিকত্ব। অন্যান্য ক্ষেত্রে, যারা বাইরে স্থায়ীভাবে বসবাস করছে, তাদেরকে "আইনের বলে" এমনিতেই বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে গণ্য করা হয়! স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সংশোধিত ইংরেজি খসড়া[৯] সম্পর্কে আইন কমিশনের মতামতে উল্লেখ করা হয় যে, ৩ ধারার (২) উপধারা বারংবার সংশোধন করা থেকে অব্যহতি পাওয়ার জন্য, বাইরে বসবাসরত এককালীন বাংলাদেশি এবং বাংলাদেশি বংশোদ্ভূতদের বাংলাদেশের (!) স্থায়ী বাসিন্দা হিসেবে গণ্য করা হোক।

কমিশনের ভাষায়, "এই সংযোজনটির অর্থ এই যে কেবলমাত্র যুক্তরাজ্য নয়, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, ইউরোপের বিভিন্ন দেশ, অস্ট্রেলিয়া এবং অন্যান্য আরও বহু দেশে বাংলাদেশের নাগরিকরা ২৫ মার্চ ১৯৭১ বা ১৫ ডিসেম্বর ১৯৭২ ও তৎপরবর্তীতে স্থায়ীভাবে বসবাস করিতেছেন। "গেজেট প্রজ্ঞাপন মারফতে সরকার ... তাহাদের বাংলাদেশের স্থায়ী বাসিন্দা হিসাবে "গণ্য" করিতে পারেন ও তাহাদের নাগরিকত্ব সম্পর্কে নিশ্চয়তা দান করিতে পারেন।" শুধু তাই নয়, আশ্চর্যের বিষয় যে "কেবলমাত্র জন্মসূত্রে নাগরিকদের বা উত্তরাধিকারক্রমে বর্তানো নাগরিকদের" মাঝে নাগরিক অর্থ সীমিত রাখা "অসাংবিধানিক ও অপ্রয়োজনীয়" বলে কমিশন মতপ্রকাশ করেন।

বাংলাদেশের নাগরিকত্ব সংক্রান্ত একটি নতুন আইন বিধিবদ্ধকরণের নিমিত্তে যে প্রস্তাবিত বিলটির ওপর কমিশনের মতামত উপরে আলোচনা করেছি, সেখানেই সম্ভবত **প্রথমবারের মতো "দ্বৈত নাগরিকত্ব" পদটি উল্লেখ করা হয়**। সেখানে ৬ নং ধারায় "দ্বৈত নাগরিকত্ব"কে নিম্নরূপে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে,

"(১) উপধারা (২)-এ বর্ণিত ব্যতিক্রম ব্যতিরেকে বাংলাদেশ কর্তৃক স্বীকৃত নয় এইরূপ কোন রাষ্ট্র বা ভূখণ্ড ব্যতীত অন্য কোন রাষ্ট্র বা ভূখণ্ডের নাগরিকত্ব অর্জন করিলে বাংলাদেশের কোন নাগরিক নির্ধারিত পদ্ধতিতে বাংলাদেশের নাগরিকত্ব বহাল রাখিতে পারিবেন।'' (পৃঃ ৮) অর্থাৎ, যে দেশের নাগরিকত্ব রয়েছে, সেই দেশের আইন অনুযায়ী একজন ব্যক্তিকে তার নাগরিক অথবা অধিবাসী মর্যাদা পরিত্যাগ করে ঘোষণা প্রদান করার বাধ্যবাধকতা রইল না![১০]

৬। উপরের যাবতীয় খসড়া নথির 'আইনানুগ প্রয়োগ সুগম হয় ২০১২ সনের ২২ জানুয়ারি, বহিরাগমন অধিশাখা-৩ এর প্রজ্ঞাপনে। সেখানে হংকং, সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া, ব্রুনাই, দক্ষিণ কোরিয়া এবং জাপানের নাগরিকদের অন্তর্ভুক্তকালে উল্লেখ করা হয় যে, "নাগরিকত্ব গ্রহণ করিলে উক্ত দেশের নাগরিকত্ব প্রাপ্তির জন্য পঠিতব্য শপথ বাক্যে যদি নিজ দেশের (বাংলাদেশের) আনুগত্য প্রত্যাহারের শপথ না থাকে, তাহা হইলে তাহার বাংলাদেশের নাগরিকত্ব বহাল থাকিবে।'' এবং তাদের বাংলাদেশ সরকারের কাছ থেকে দ্বৈত নাগরিকত্ব গ্রহণের প্রয়োজন হইবে না।

৭। গণমাধ্যম সূত্রে জেনেছি যে খসড়া নাগরিকত্ব বিল ২০১৬ সেই বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে কেবিনেটের সম্মতি পেয়েছে। খসড়াটি জনসমক্ষে না আসায় তার থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে কোন আলোচনা সম্ভব হয়নি। তবে তার কিছু দিকের ওপর উন্মুক্ত আলোচনায় 'নাগরিক' সমাজের কিছু সংগঠনকে অবস্থান নিতে দেখা গেছে, যা নিঃসন্দেহে পর্যালোচনার দাবি রাখে।

৮। এখন সরকারি বিজ্ঞপ্তিতে 'দ্বৈত নাগরিক' পদটি যত্রতত্র ব্যবহারে দ্বিধা নেই। বললে অত্যুক্তি হবে না যে, সেই শ্রেণির ব্যক্তিদের সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয় সহজ করতে এবং রাজনীতিতে অংশগ্রহণ সম্ভব

করতে তোড়জোড় চলছে। তার একটি নমুনা দেখা যায় নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের নির্বাচন সহায়তা-২ শাখা থেকে ১২/০৪/২০২২ ইং তারিখের বিজ্ঞপ্তিতে, যার বিষয় ছিল, "দ্বৈত নাগরিক ও বাংলাদেশের নাগরিকত্ব অর্জনকারী বিদেশী নাগরিকদের ভোটার তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্ত প্রসঙ্গে"। সেখানে উল্লেখ রয়েছে (যা এ নিবন্ধে পূর্বে উল্লেখ করেছি) যে, বিভিন্ন দেশে নাগরিকত্ব গ্রহণকারী বাংলাদেশের নাগরিককে "বাংলাদেশ সরকারের নিকট হতে দ্বৈত নাগরিকত্ব সনদ গ্রহণের প্রয়োজন হবে না।" শুধু তাই নয়, একই বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে যে, (০৩) "প্রবাসী বাংলাদেশিদের[১১] সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে ভোটার হিসেবে নিবন্ধন কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে এবং তারা যেন কোনোভাবেই হয়রানির শিকার না হন সেবিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলকে সচেতন থাকার জন্য নির্দেশক্রমে অনূর্ধ্ব করা হলো।''

বাংলাদেশে দ্বৈত নাগরিকত্বের যাত্রাপথের সংক্ষিপ্ত বিবরণী

সাধারণত, নাগরিকত্ব একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের প্রেক্ষিতে সংজ্ঞায়িত হয়। তাই জন্মসূত্রে অথবা উত্তরাধিকারক্রমে হওয়া একজন নাগরিক পূর্ণত্ব পান যদি তিনি সেই ভূখণ্ডের নিবাসী হন। যেসব ক্ষেত্রে নতুন রাষ্ট্রগঠনকালে নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের বাইরের নিবাসীদের নাগরিকত্ব নির্ধারণে গুনতিতে নিতে হয়, সেসব ক্ষেত্রে নিবাসভিত্তিক শর্তের এককালীন ছাড় দেওয়ার প্রয়োজন পড়ে। বাংলাদেশে দ্বৈত নাগরিকত্বের উদ্ভব ও বিস্তার বুঝতে হলে এই এককালীন ছাড়কে দীর্ঘসূত্রিতায় ফেলে ভিনদেশে নাগরিকত্ব নেওয়া বাংলাদেশিদের স্বার্থ প্রতিষ্ঠার রাজনীতিক-অর্থনীতি অনুধাবন প্রয়োজন।

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার অব্যাহতি পরেই নাগরিকত্ব সংক্রান্ত ১৯৭২ এর রাষ্ট্রপতির আদেশ মূলত নাগরিকত্ব আইন ১৯৫১ কে অনুসরণ করে। সেখানে দ্বৈত নাগরিকের কোনো স্থান ছিল না। তাই অনুমেয় যে, একজন বাংলাদেশি নাগরিক ভিন্ন কোন দেশের নাগরিকত্ব গ্রহণ করলে তাকে বাংলাদেশের নাগরিকত্ব হারাতে হতো। তবে সেদেশের নাগরিকত্ব খারিজ করে আবারো তিনি বাংলাদেশের নাগরিকত্ব ফিরে পেতে পারেন যদি তিনি উক্ত দেশের আইন অনুযায়ী নাগরিকত্ব খারিজ করে আসেন।

নাগরিকত্ব আইন ১৯৫১ গভীরভাবে পড়লে একজন বুঝবেন যে উপনিবেশিক শক্তির প্রস্থানকালে সৃষ্ট ঘটনায় এক বিশাল জনগোষ্ঠী স্বভূমি ত্যাগ করতে বাধ্য হন, যাদের অনেকেই তদানীন্তন পূর্ব-পাকিস্তানে আবাস নেন (বা নিতে সম্মত হন) ও পাকিস্তানের নাগরিকত্ব গ্রহণ করেন। তাই নির্দিষ্ট সময়ে ভিন্ন ভূখণ্ডের নিবাসীদের নাগরিকত্বে অন্তর্ভুক্ত করবার বিধান রাখার প্রয়োজন দেখা দেয়, যা ১৯৭৩ এর সংশোধনীতে অন্তর্ভুক্ত হয়। পরবর্তীকালে, নিবাসকেন্দ্রিক আইন-গঠনে, মূল উদ্দেশ্য থেকে বিচ্যুতি ঘটেছে বলে মনে হয়, যার দুটো বিশেষভাবে উল্লেখ্য। (১) বাংলাদেশের একজন নাগরিক অন্য কোনও দেশের নাগরিকত্ব নিলে, তার বাংলাদেশের নাগরিকত্ব খারিজ হওয়ার রীতি বাস্তবিক চর্চায় ও আইনের পাতা থেকে অদৃশ্য হয়েছে। এমনকি, অন্য দেশের নাগরিকত্ব খারিজ করে ফের বাংলাদেশের নাগরিক হওয়ার জন্য সে দেশের নিয়ম অনুযায়ী নাগরিকত্ব খারিজ করার বাধ্যবাধকতা আজ স্মৃতির পাতায় হারিয়ে গেছে।

(২) নির্দিষ্ট সময়কালে (১৯৭১ সনের স্বাধীনতা যুদ্ধ ও তার পরপরই) বাংলাদেশ ভূখণ্ডের বাইরের নিবাসীদের যে উদ্দেশ্যে নাগরিক হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল এবং তা কার্যকর করবার জন্য,

আইনের ভাষায়, নির্দিষ্ট দেশে (বা দেশসমূহে) কারো নিবাস থাকলে তাকে বাংলাদেশের নিবাসী হিসেবেও গণ্য করা হয়েছিল, তার মেয়াদ ফুরিয়ে গেলেও এই ধারাটির অবাধ ব্যবহার 'দ্বৈত নাগরিকত্ব' -এর পথ সুগম করেছে। সাধারণ জ্ঞানে বুঝেছি যে, নিয়মমাফিকভাবে বাইরের নাগরিকত্ব খারিজ করার বিষয়টি পাশ কাটিয়ে যাওয়া হয়েছে। তবে এ ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের দ্বিধা প্রকাশ পায় বিভিন্ন খসড়ায় প্রকাশিত বিভিন্ন অভিব্যক্তিতে। যেমন, ২০১২ তে (যুক্তরাষ্ট্রে) বাংলাদেশ দূতাবাস প্রচারিত খসড়ায়, "নাগরিকত্ব পরিত্যাগ" প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হয় যে, "কোন সাবালক ও সমর্থ নাগরিক কোনো হলফনামা দ্বারা তাহার বাংলাদেশের নাগরিকত্ব পরিত্যাগের ঘোষণা করিলে" তা নিবন্ধিত হবে। লক্ষণীয় যে, সেই খসড়ায় নির্দিষ্ট দেশের নিয়ম অনুযায়ী নাগরিকত্ব পরিত্যাগের বাধ্যবাধকতার উল্লেখ নেই।

মাঝেমধ্যে গুঞ্জরন শোনা গেছে যে, যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্ব প্রাপ্তির প্রাক্কালে সে দেশের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে শপথ নিতে হয়। সে ব্যাপারে বাংলাদেশ পক্ষ নীরব থেকেছে। অথচ ২০১২ সনের ২২ জানুয়ারির, বহিরাগমন অধিশাখা-৩ এর প্রজ্ঞাপনে পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় কিছু দেশে নাগরিকত্ব গ্রহণকারীদের প্রেক্ষিতে বলা হয় যে, পঠিতব্য শপথ বাক্যে যদি নিজ দেশের (বাংলাদেশের) আনুগত্য প্রত্যাহারের শপথ না থাকে, তাহা হইলে তাহাদের বাংলাদেশের নাগরিকত্ব বহাল থাকিবে। বাইরের দেশগুলোতে নাগরিকত্ব গ্রহণকালে আনুগত্য প্রকাশের কি অর্থ এবং তা বাংলাদেশের প্রতি আনুগত্যের সাথে কখন কীভাবে সাংঘর্ষিক হতে পারে, তা অনুধাবন কঠিন হওয়ার কথা নয়। [অনেক সাইটে তথ্য পাওয়া যায়। তেমন একটি এখানে উল্লেখ করলাম, https://www.law.cornell.edu/uscode/text/8/1481]

কোথায় যেন সকল যুক্তি হার মেনে যায় আইনের ভাষার কাছে! আজকের পৃথিবীতে সত্যিই কি সকল সময়ের জন্য একইসাথে দুটো দেশের প্রতি আনুগত্য রেখে চলা সম্ভব? "অন্য দেশের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ না করলে নাগরিকত্ব হারাবো না" এবং "উৎস দেশের (বাংলাদেশের) প্রতি আনুগত্য প্রত্যাহারের উল্লেখ শপথ পাঠে না থাকলে নাগরিকত্ব হারাব না" – এ দুটো কি সমার্থক? আন্তর্জাতিক পরিসরে ক্ষমতার এবং আপেক্ষিক আর্থিক আকর্ষণে চরম বৈষম্য থাকলে কি ক্ষমতাধরদের প্রতি আনুগত্যকে আকৃষ্ট করবে না? অথচ, বিভিন্ন এককালীন উপনিবেশিক দেশগুলোতে নাগরিকত্ব আইন প্রণয়নের উদ্যোগের ইতিহাস ও সাদৃশ্য দেখলে শঙ্কা জাগে!

সরকারি বিজ্ঞপ্তির বাইরে নাগরিকত্বে দ্বৈততা নিয়ে দৃশ্যমান আলোচনা

ভালোমন্দের বিচারে না যেয়ে নিবন্ধটির এই পর্ব শেষ করব নাগরিকত্ব আইন সম্পর্কে জনসমক্ষে আসা কিছু গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্যের প্রতি পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। যে নিবন্ধগুলো পড়ার সুযোগ হয়েছে সেগুলো পাদটীকায় উল্লেখ করলাম, আমার লেখা সহ।[১২] সম্ভবত ২০১৬ সনের নাগরিকত্ব বিল কেবিনেটের সম্মতি পেয়ে জনসমক্ষে আলোচিত হওয়ার সুযোগ পায়। রিদওয়ানুল হক-এর ২০১৬ সনের রিপোর্ট অন সিটিজেনশিপ ল' বাংলাদেশ এই নিবন্ধে আলোচনা করিনি, যদিও উপমহাদেশে নাগরিক আইনের বিবর্তন সম্পর্কে সেখানে অনেক তথ্য আছে। আমার তালিকার প্রথম লেখাটি ২০১৭ সনের। সেখানে বদিউল আলম মজুমদার, চলতি ধারায় নাগরিকত্ব আইন ব্যাখ্যার আঙ্গিকে, বাংলাদেশের রাজনীতিতে দ্বৈত নাগরিকদের অবাধ সুযোগ না দেয়াকে বৈষম্যমূলক মনে করছেন।

অর্থাৎ, তিনি চাইছেন যেন বিদেশে নাগরিকত্ব নেয়ার পর তারা বাংলাদেশকে শাসন করতে পারেন! কিছুটা ভিন্ন যুক্তির আড়ালে একই প্রস্তাব (পরামর্শ) পাওয়া যায় নাজলি কিবরিয়ার লেখনীতে। ২০২১-এ ইকতেদার আহমেদ-এর লেখা ব্যতিক্রম-ধর্মী। আমার সীমিত জ্ঞানে বুঝি যে সম্ভবত তিনিই প্রথম আমাদের নাগরিকত্ব আইনে কিছু অসংগতির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। বিরূপক্ষ পালের একাধিক লেখা মূলত যুক্তরাষ্ট্রের 'দ্বৈত নাগরিক'দের গুণকীর্তনে নিবিষ্ট। অবাক হয়েছি যে একই সুর ধ্বনিত হয়েছিল ২০০৭ সনের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সংশোধিত ইংরেজি খসড়াটি সম্পর্কে কমিশনের[১৩] মতামতে। বাইরে স্থায়ীভাবে বসবাসরতদের সম্পর্কে কমিশন মত প্রকাশ করেন যে, "স্বাধীনতা যুদ্ধে তাহাদের ভূমিকা অবিসংবাদিত। তাহাদের প্রেরিত বৈদেশিক মুদ্রা বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের একটি সিংহভাগ। সময়ের প্রয়োজনে যদি এইসব দেশে বসবাসরত ও বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন ও প্রেরণরত বাংলাদেশের নাগরিকদের নাগরিকত্ব কোনোরকম আনুষ্ঠানিক দরখাস্ত বা প্রশাসনিক হস্তক্ষেপ ছাড়াই পূর্ণভাবে বহাল রাখিতে হয়, তাহা হইলে সরকারের হাতে এমন একটি ইচ্ছাধীন ক্ষমতা সময়ে সময়ে প্রয়োগ করার বিধান থাকা প্রয়োজন যাহাতে গেজেট প্রজ্ঞাপনের মারফত সরকার যুক্তরাজ্যে বসবাসরত ব্যক্তিদের ছাড়াও অন্যান্য দেশে বসবাসরত ব্যক্তিদেরকেও বসবাসের তারিখ ও সাল নির্ধারণপূর্বক তাহাদের বাংলাদেশের স্থায়ী বাসিন্দা হিসেবে "গণ্য" করিতে পারেন ও তাহাদের নাগরিকত্ব সম্পর্কে নিশ্চয়তা দান করিতে পারেন।''

২০১৬ সনের নাগরিকত্ব বিলটির প্রতি "দেশের" সমাজকর্মীদের মাঝে প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায় RMMRU আয়োজিত একই বছরের একটি অনুষ্ঠানে। আমার জানা ছিলনা যে ততদিনে Alliance for Citizenship Laws and Rights নামক একটি মোর্চা গঠন হয়েছে, যার সদস্য হিসেবে রয়েছে ছয়টি অতিপরিচিত "জাতীয়" এনজিও, আইন ও সালিশ কেন্দ্র, বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা আইনজীবী পরিষদ (অ্যাসোসিয়েশন), নাগরিক উদ্যোগ, নারীপক্ষ, সুশাসনের জন্য নাগরিক (সুজন) এবং RMMRU ! মোর্চাটি যথার্থভাব শিশু ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কথা উল্লেখ করেছে। কিন্তু নাগরিক আইনের জন্য প্রাসঙ্গিক বিষয়ে আপাতদৃষ্টিতে এনআরবিদের মুখপাত্র হওয়ার কথা বললেও বিভিন্ন নাগরিক গোষ্ঠীর মধ্যকার অধিকারের বৈষম্য দূর করার জন্য তাদের আহবানে ভিন্ন সুর পাওয়া যায়। এই আহবান দ্বৈত নাগরিকদের রাজনীতিতে (বৈষম্যহীন!) অবাধ অংশগ্রহণের যুক্তি দেখিয়ে এফসিবিওদের স্বার্থে ব্যবহৃত হবে না তো?

শেষেরও শুরু আছে – পরবর্তী করণীয়

এ নিবন্ধে বাংলাদেশের নাগরিকত্ব আইনের বিবিধ দিক ও সেসবের পরিবর্তন-ধারা উপস্থাপন করা হয়েছে। ঐতিহাসিকভাবে নাগরিকত্ব আইন যেভাবে প্রণীত হয়েছে, আইন প্রণয়নকারীগণ তার পুনর্মূল্যায়ন করতে পারেন। অবশ্য আইন-প্রণয়নকারীদের মাঝেই যদি ভিনদেশের নাগরিক থাকেন, স্বার্থের সংঘাত এড়ানো দুষ্কর।

সাদামাটাভাবে ভাবলে, বাংলাদেশের মতো দেশের জন্য নাগরিকত্ব নির্ধারণের ক্ষেত্রে কয়েকটি পথ খোলা রয়েছে।

প্রথমত, নাগরিকত্বকে একটি ভূখণ্ড ও রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্যে বাধা, যেখানে দ্বৈত নাগরিকত্বের কোনও স্থান থাকবে না – যেমনটি ১৯৫১ নাগরিকত্ব আইনে ছিল এবং ইন্ডিয়াতে কার্যকর রয়েছে। এক্ষেত্রে

দুটো বিকল্প থাকতে পারে — (১ক) একজন ব্যক্তি অন্য যে দেশের নাগরিক হবেন, বাংলাদেশ তাকে সেই দেশের অন্যান্য নাগরিকদের মতো গণ্য করবে, অন্যথায় বৈষম্যের দোষে দুষ্ট হতে হবে। (১খ) যে সকল বিদেশি নাগরিক একসময় নিজেরা অথবা তাদের মাতাপিতা বাংলাদেশের নাগরিক ছিলেন, তাদের ভিন্ন গোষ্ঠী চিহ্নিত করে নীতি নির্ধারণ। শেষোক্ত ক্ষেত্রে, পূর্বসূরিদের কয় প্রজন্ম অনুমোদনযোগ্য তা শুরুতেই স্থির করা যেতে পারে[১৪]।

দ্বিতীয় পথে, যে কোনো ব্যক্তি একবার জন্মসূত্রে অথবা উত্তরাধিকারক্রমে বাংলাদেশের নাগরিক হলে তিনি আমৃত্যু বাংলাদেশের নাগরিক রয়ে যাবেন এবং তিনি (বাংলাদেশ কর্তৃক স্বীকৃত) অন্য যে কোনও দেশের নাগরিকত্ব নিতে পারবেন। নিঃসন্দেহে আনুগত্য নিশ্চিত করা জরুরি নয় এবং সে কারণে শপথকে কেন্দ্র করে ছেলেমানুষি অজুহাত তুলে লোক ভুলানোর প্রয়োজন নেই।

যে পথই বাংলাদেশ নিক না কেন, তথ্যনির্ভর সিদ্ধান্তের জন্য নাগরিকত্বের শ্রেণি-বিভাজন প্রয়োজন। আশা করব যে, উপযুক্ত বিশ্লেষণ-কাঠামোতে বিকল্প পথের সম্ভাব্য তাৎপর্য বিবেচনায় এনে আগামী দিনের সরকার বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রের স্থায়িত্ব নিশ্চিত করবে। এরপরও প্রশ্ন রয়ে যায়, কে ভোট দিতে পারবে এবং কারা সংসদ-সদস্য হওয়ার যোগ্যতা রাখেন, সে ব্যাপারটি নির্বাচন কমিশনকে সুচিন্তিতভাবে স্থির করতে হবে। অন্যথায় নাগরিকত্ব নির্ধারণ ও রাষ্ট্রগঠনের কাজ অসম্পূর্ণ রয়ে যাবে।

পাদটীকা:

১. নিবন্ধটি থেকে প্রাসঙ্গিক অংশটি উদ্ধৃত করলাম, "In more recent past, there has emerged a new element in the post-neocolonial "masnadi" culture of political governance across globe. It is the rise of a new group of people who, voluntarily or involuntarily, declared loyalty to an advanced country without losing touch with their roots." See, "Difficulties in defining public needs and aspirations", Prothom Alo (English), 30 January 2019.

২. উপনিবেশিক ধ্যানধারণা, আইন ও শাসনব্যবস্থা আজও চালু থাকার যে অভিযোগ শোনা যায়, অন্যান্য সম্ভাব্য কারণের মাঝে এজাতীয় জড়তাও ভূমিকা রাখতে পারে। এই পর্যালোচনার শেষপ্রান্তে পৌঁছে, এক বিকল্প সম্ভাবনাকে উড়িয়ে দিতে পারিনা — আবারো উপনিবেশিক কাঠামোতে বিলীন হবার জন্যই কি আমূল পরিবর্তন আনা হয়নি!?

৩. পরবর্তী আলোচনায় স্পষ্ট হবে যে নিবাস-ধারণার যত্রতত্র সংশোধনী "জন্মসূত্রে ও উত্তরাধিকারক্রমে" জাতীয় নৈর্ব্যক্তিক নির্ণায়কগুলোকে ম্লান করে দিয়েছে।

৪. See, 5. (3) "The grant of a certificate of naturalization shall be in the absolute discretion of the Government, and no appeal shall lie from any refusal to grant any such certificate or to include in any such grant any particular right, privilege or capacity." Source: http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-139/section-4749.html

৫. "A person to whom Article 2 would have ordinarily applied but for his residence in the United Kingdom shall be deemed to continue to be permanent resident in Bangladesh within the

meaning of that Article: Provided that the Government may notify, in the official Gazette, any person or categories of persons to whom this Article shall not apply." (Act No. V of 1973)

৬. "The Government may grant citizenship of Bangladesh to any person who is a citizen of any state of Europe or North America or of any other state which the Government may, by notification in the official Gazette, specify in this behalf."

৭. এই অংশে, "দ্বৈত নাগরিকত্ব"-এর অন্তর্ভুক্তি ১৯৭৮ সনে, না কি ২০০৬-০৭ সময়কালের উদ্যোগ থেকে, তা অনুধাবন করতে পারিনি।

৮. ১৯৯০ সনে, Act No. LVIII তে উল্লেখ করা হয়, "The Government may, upon an application made to it in this behalf in the manner prescribed, grant right of permanent residence to any person on such conditions as may be prescribed." দ্বিপাক্ষিক করচুক্তি সর্বাগ্রে যুক্তরাজ্যের সাথে হয়েছে ১৯৭৮-৮০, কানাডার সাথে ১৯৮৫, ডেনমার্ক ১৯৯৭ এবং বেলজিয়াম এর সাথে ১৯৯৮ সনে। আজ প্রায় ৩৬টি দেশের সাথে দ্বিপাক্ষিক করচুক্তি রয়েছে, যে প্রক্রিয়া বেগবান হয় ২০০৪-০৬ সময়কালে যুক্তরাষ্ট্রের সাথে চুক্তি ও ২০০৭ সনে রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পরপর।

৯. স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বহিরাগমন শাখা-৩-এর স্মারক নং স্বঃমঃ (বহি-৩)/নথি-০২-২০০৫-১১৮৬ তারিখ ১২/০৬/২০০৭ ইং।

১০. বাংলাদেশ নাগরিকত্ব আইন, ২০১২ শীর্ষক খসড়াতে এবং যুক্তরাষ্ট্রের ডিসিতে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাস এর মিনিস্টার কনস্যুলার মোঃ সামছুল হক কর্তৃক (সেখানকার অধিবাসীদের কাছে) প্রেরিত নথির ৩য় অধ্যায়ে নাগরিকত্ব পরিসমাপ্তি অংশে ১৬ ধারায় উপরের কথাগুলো আরও স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, "নাগরিকত্ব পরিত্যাগ (renunciation of citizenship) (১) কোন সাবালক ও সমর্থ নাগরিক কোন হলফনামা দ্বারা তাহার বাংলাদেশের নাগরিকত্ব পরিত্যাগের ঘোষণা করিলে, উক্তরূপ ঘোষণা সরকার নিবন্ধন করিবে এবং এইরূপ নিবন্ধনের পর উক্ত ব্যক্তির বাংলাদেশের নাগরিকত্বের পরিসমাপ্তি ঘটিবে।"

১১. প্রবাসী বলতে আমরা একসময়ে সেসব বাংলাদেশী নাগরিকদের বুঝাতাম যারা বাইরের কোনও দেশে নিবাসী (স্বদেশে অনিবাসী) এবং তারাই এন,আর,বি হিসেবে পরিচিত ছিল এবং বাইরের শ্রমবাজারে কাজ করে বৈদেশিক মুদ্রা (রেমিটেন্স) প্রেরণ করতেন। বাংলাদেশে শেকড় ছিল বা আছে অথচ আজ যারা ভিন্ন দেশের নাগরিকত্ব নিয়েছে তাদেরকে এফ,সি,বি,ও (ফরেন সিটিজেনস অফ বাংলাদেশ অরিজিন) বলা যায়, কিন্তু প্রবাসী বলাটা বিভ্রান্তিকর। অথচ, উপরের বিজ্ঞপ্তিতে প্রবাসী বলতে এফ,সি,বি,ও-দেরকে বুঝানো হচ্ছে। বিচিত্র পথ ধরে আজ বিদেশী নাগরিক নয়, বরং প্রবাসে নিবাসরত বাংলাদেশী নাগরিক!!

১২. ড. বদিউল আলম মজুমদার -এর "নাগরিকত্ব আইন নিয়ে তুঘলকি কাণ্ড" (প্রথম আলো, ৬ জানুয়ারি, ২০১৭); ইকতেদার আহমেদ এর "দ্বৈত নাগরিকত্বে সাংবিধানিক পদধারীদের রুদ্ধতার ব্যাপ্তি" (দৈনিক নয়া দিগন্ত, ১৯ অক্টোবর ২০২১); Nazli Kibria, "Probashi: Histories of the Bangladesh diaspora" (The Daily Star, Nov 21, 2022); Birupaksha Paul, "Is dual citizenship to blame for

money laundering?" (The Daily Star, 9 March 2023). এছাড়া দৈনিকে প্রকাশিত আমার কয়েকটি উল্লেখ করছি- Sajjad Zohir, "Dual citizens, USD market volatility and external borrowing" (The Business Standard, Panorama, 26 August, 2022); "দ্বৈত নাগরিকত্ব, ডলার বাজারের অস্থিতিশীলতা এবং বৈদেশিক ঋণ (প্রথম পর্ব)" (বণিক বার্তা, নভেম্বর ০৩, ২০২২); "বৈদেশিক মুদ্রাবাজার এবং ডিসি ব্যবস্থার অধীনে নীতি-পক্ষপাত (২য় পর্ব)" (বণিক বার্তা, নভেম্বর ১০, ২০২২); "Straight talk: The issue of dual citizenship" (The Business Standard, Panorama, 25 March, 2023)

১৩. বিচারপতি মোস্তফা কামালের সভাপতিত্বে তিন-সদস্য কমিটি। বহিরাগমন শাখা-৩-এর স্মারক নং স্বঃমঃ (বহি-৩)/নথি-০২-২০০৫-১১৮৬ তারিখ ১২/০৬/২০০৭ ইং দ্রষ্টব্য।

১৪. আইনে লিঙ্গ-প্রকাশ বিড়ম্বনায় ফেলে। 'পিতা ও প্রপিতামহ' আমার ধারণায় 'মাতা-পিতা', এবং 'দাদা-দাদী ও নানা-নানী'। অবশ্য বৈবাহিকসূত্রে নাগরিকত্ব প্রাপ্তির ক্ষেত্রে জটিলতা বৃদ্ধি পাবে কিনা লেখকের জানা নেই।

(নিবন্ধে প্রকাশিত মতামত লেখকের একান্তই নিজস্ব)

ড. সাজ্জাদ জহির: অর্থনীতিবিদ; নির্বাহী পরিচালক, ইকোনমিক রিসার্চ গ্রুপ (ইআরজি)
sajjadzohir@gmail.com

(পর্ব-১)
Source: https://www.kalbela.com/opinion/sub-editorial/19292

(পর্ব-২)
Source: https://www.kalbela.com/opinion/sub-editorial/23435